নবম পরিচ্ছেদ

লৌকিক খেলাধূলা

ভূমিকাঃ

দৈনন্দিন জীবনে সকল আচার, আচরণ, লোকাচার, পোষাক - পরিচ্ছদ, সংস্কার ও বিশ্বাস, আমোদ - প্রমোদ ইত্যাদি জীবন চর্যার বহিঃপ্রকাশের রীতিনীতিই হল সংস্কৃতি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বলা যায় খেলাধূলাও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংস্কৃতি যেমন দুটি স্তর বা ধারায় বিভক্ত - শিষ্ট সংস্কৃতি এবং লোক সংস্কৃতি, তেমনি খেলাধূলার ক্ষেত্রেও দুটি ধারা বা বিভাজন দেখা যায়। একটি শহুরে শিষ্ট ক্রীড়া অপরটি গ্রাম্য লৌকিক ক্রীড়া বা খেলাধূলা। লোকজীবন নির্ভর এই লৌকিক খেলাধূলা যেমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় না তেমনি কঠোর নিয়মকানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে না। স্থানভেদে রূপগত ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু মূল বিষয় একই থাকে। আবার শহুরে জীবননির্ভর শিষ্ট খেলাধূলার ক্ষেত্রে দেখা যায় শহুরে জীবনের প্রভাব। যেমন - ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিলটেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি। অপর পক্ষে ষোলপাইতা, হা - ডু - ডু, ঠেঙ্গু হাটা, বাসুদিয়া ইত্যাদি খেলাগুলি নির্দিষ্ট নীতির বাইরে স্থানভেদে ভিন্নরূপেও অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই মানুষ তার চিত্ত বিনোদনের জন্য নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করলেও খেলাধূলার মধ্যে শহর ও গ্রামের পার্থক্য আগাগোড়াই চোখে পড়ে। কোচবিহার জেলার পাঁচটি মহকুমার গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী যুবক ও বয়স্ক পুরুষগণ, কোন কোন ক্ষেত্রে যুবতী ও কিশোরীগণ ধানকাটা ও শস্য বোনার পর যে মরসুমী অবসর পান তখনই তাদের লোকায়ত জীবনের বিভিন্ন ক্রীড়ায় মত্ত থাকতে দেখা যায়।

জেলায় প্রচলিত যে প্রাচীন খেলাধূলা লোক জীবনের ঐতিহ্যবাহী, বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ নয়, যা দৈনন্দিন জীবন চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘ দিন ধরে লোক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে, সেই খেলাধূলাকেই আমরা আলোচ্য পরিচ্ছেদে লোকক্রীড়া বা লৌকিক খেলাধূলা নামে অভিহিত করেছি।

জেলার দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, হলদিবাড়ী (থানা), মেখলিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ মহকুমার গ্রামীণ পরিবেশে যে লৌকিক খেলাধূলার চর্চা আজও প্রাণবন্ত তা হল - ডাংগুটি(গুলি), চেমু, হা - ডু - ডু, কবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, জলকুমির ঠেঙ্গ হাটা, ষোলপাইতা, মোগল পাঠান, আটঘরিয়া প্রভৃতি। এছাড়াও আছে বিভিন্ন লোকায়ত ও ধর্মীয় জীবনে ব্রত ও আনুষ্ঠানিক খেলাধূলা। প্রকৃতপক্ষে জৈবিক প্রয়োজন বোধ থেকেই গ্রামীণ এই খেলাগুলির রীতি ও কৌশল জেলার গ্রামবাসীগণ আয়ত্ত করেছেন। আদিম অরণ্যচারী মানুষ একদিন পশুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকত এবং শিকার ছিল তার জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুস্তি ও লাঠি খেলা ছিল একসময় আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ। তিস্তা, তোর্ষা কালজানির দেশ কোচবিহার। নদী প্রধান এই জেলার বন্যা বা প্লাবন একটি বাৎসরিক ঘটনা। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই নদীবহুল গ্রামের মানুষ অনেকেই দুপুরের স্নান নদীতেই সারেন। আবার বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে আত্মরক্ষার জন্য তারাশিখেছেন সাঁতার। এই সাঁতারকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে জলকুমির, অক্টুল - বক্টুল ও নৌকা বাইচের মত খেলা।

বাংলার লৌকিকগ্রামীণ ক্রীড়া বা খেলাধূলা সম্পর্কে আলোচিত বহু গ্রন্থ থাকলেও, এমনকি লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের অজস্র নিদর্শনের উপর আলোকপাত করে গবেষণাধর্মী প্রচুর গ্রন্থ রচিত হলেও কোচবিহারের লোকক্রীড়ার উপর আলোচিত উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম ডঃ চারু সান্যাল মহাশয়ের Rajbansis of North Bengal গ্রন্থখানি, যদিও গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্র মূলত জলপাইগুড়ি জেলা, তবুও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত খেলাধূলা সম্পর্কিত আলোচনায় গ্রন্থটি যে পথিকৃৎ এ বিষয়ে কোন সংসয় নেই। জেলার লৌকিক সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য এই নিদর্শন লোক চক্ষুর আড়ালে অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার মত বহমান। তাই এ বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণে আমাদের আলোচিত গ্রন্থের তথ্যসূত্রের চেয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধানের উপরই বেশী নির্ভর করতে হয়েছে।

ক্ষেত্রানুসন্ধানের ভিত্তিতে কোচবিহারের প্রচলিত লৌকিক খেলাধূলাকে আমরা প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করেছি।

প্রথমত ঃ শ্রমসাপেক্ষ শরীর চর্চামূলক মুক্তাঙ্গন খেলা।

তৃতীয়ত ঃ জলের খেলা।
চতুর্থত ঃ আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় ক্রীড়া (খেলাধূলা) (স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচিত)।

এই চারটি ভাগের মধ্যেই জেলার প্রত্যন্ত সকল গ্রামাঞ্চলের অজস্র লোকক্রীড়ার প্রাণস্পন্দন শোনা যায়।

জেলার পাঁচটি মহকুমার দৈনন্দিন গ্রামীণ জীবনের চলমান জীবন্ত রূপের প্রতিচ্ছবির কিছু কিছু সন্ধান পাই এই লোকক্রীড়ার মধ্যে। এক কথায় যার মাধ্যমে একাধারে ঘটে লোকায়ত সংস্কৃতি ও সুস্থ মূল্যবোধের প্রসার ও প্রকাশ। বাঙালীর খেলাধূলা বলতে আমরা যেমন বুঝি লৌকিক খেলাধূলাকে তেমনি এর অস্তিত্বের সন্ধান করি লোকসংস্কৃতির মধ্যে। কোচবিহারে প্রচলিত লৌকিক সব খেলাধূলাতেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লোকাচার, রীতিনীতি, শব্দচয়ন ও উচ্চারণরীতি বিদ্যমান। কোন কোন গ্রামীণ খেলাধূলাকে ধৈর্য ও সংযম শিক্ষার উপায়বলে মনে করা হয়। যেমন আট ঘরিয়া, ষোলপাইতা, মোগলপাঠান, একাদোক্কা ইত্যাদি। আবার কোন কোন গ্রামীণ খেলায় গণিত শিক্ষার উপাদান চোখে পড়ে। এইসব খেলায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এক নিঃশ্বাসে 'দম' দিতে গিয়ে হৃৎ - যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। জেলায় প্রচলিত কানামাছি নামক লৌকিক খেলায় তাই দেখা যায় ছড়া - আবৃত্তি ও খেলার পাশাপাশি চলে। যেমন — "আনি মানি জানি না/পরের ছেলে মানি না।" জেলার সর্বত্রই গ্রামীণ সর্বজনপ্রিয় খেলা হল হা - ডু - ডু, যার আধুনিক নাম কবাডি। স্থানীয় মুসলিম সমাজে সুঠামদেহী পুরুষদের মধ্যে এই খেলায় আগ্রহ অনেক বেশী দেখা যায়। তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর ও কৃষ্ণপুর গ্রাম এই হা - ডু - ডু খেলার একটি উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান। উক্তগ্রামের গহীম মিঞা এক সময় জেলার কৃতি হা - ডু - ডু খেলোয়াড় ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ - প্রশাসনের মাধ্যমে এই লৌকিক ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট। এই জেলার গ্রামীণ খেলাধূলার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য হল অনুশীলন পদ্ধতি, খেলার বিষয়গুণ এবং ঋতু পর্যায়ের বিভিন্ন সময়ে খেলার সময় নির্বাচন।

জেলার এক সময়ের সেটেল্‌মেন্ট নায়েব আহেল্‌কার হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী তাঁর Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement গ্রন্থে আজ থেকে একশত বছর পূর্বে কোচবিহারে প্রচলিত কয়েকটি লৌকিক ক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন - "Of the Out-door games footi - chila,Nab and Kana Kani are the chief. Among the in - door games the following Partaking of the nature of the chess play, may be mentioned - chawpati, shatgharer pakta, Khalghak, Mogal - Pathan or sola - Paita, chakar - chal, Bagh - baghini and tepaita"[১] এর মধ্যে মুক্তাঙ্গন বা বাইরের উল্লেখযোগ্য খেলা হল — ফাটিচিলা, কানাকানি প্রভৃতি। অপরপক্ষে গ্রামীণ ঘরোয়া জনপ্রিয় খেলাগুলি হল — চৌপাটি, সাতঘরের পকেট, খালখাগ, মোগল পাঠান, ষোল পাইতা, চোকোর চাল, বাঘবাঘিনী, তে - পাইতা প্রভৃতি।

উক্ত বিশ্লেষণে আমরা একটি জিনিস পরিষ্কার দেখতে পাই এবং এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সে সময় কোচবিহারে মুক্তাঙ্গন খেলাধূলার চেয়ে ঘরোয়া খেলাধূলার কদর ছিল বেশী। এর একটি কারণ উল্লেখ করা যায় তা হল - লোকক্রীড়ার উ পযুক্ত যে স্থান জনবিরল মুক্তাঙ্গন বা প্রান্তর তা বর্তমানের মত এত নিরাপদ ছিল না।

আবার দাবার অনুকরণে এখানে কিছু খেলা প্রচলিত ছিল যেগুলি আজ বিলুপ্ত প্রায়। যেমন - চৌপাটি সাতঘরের পকেট, খালখাগ, চকোর চাল ইত্যাদি।

জেলায় প্রচলিত লৌকিক ক্রীড়ার ক্ষেত্র সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাই, সকল ক্ষেত্রেই নিয়ম কানুন কঠোর ভাবে পালিত হয় না। কোথাও এই নিয়ম কানুন যেমন কঠোর, তেমনি কোন কোন লোকক্রীড়ায় তা শিথিল। আবার কোন খেলায় নিয়মকানুনের চেয়ে ঐতিহ্যের অনুসরণ বেশী।

শরীর চর্চা মূলক মুক্তাঙ্গন ক্রীড়া ঃ
হা - ডু - ডু ঃ লোকায়ত খেলাধূলার বিশেষজ্ঞগণের মতে হাঁটু শব্দ থেকেই হা - ডু - ডু নামের উৎপত্তি। হাঁটু > হাডু

+ ডু = হা - ডু - ডু। হাঁটু বা উরুর উপর হাতের তাল দিয়ে যেমন খেলোয়াড় 'ডুগ' বা দম দেয় আবার প্রতিপক্ষের দল তার হাতে বা হাঁটুতে টান ও প্যাঁচ দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করে, তাকে স্থানীয় ভাষায় 'ক্যাচকি' বলে। কোচবিহারে প্রচলিত এই লোক ক্রীড়ায় খেলা শুরুর আগে একটি সংস্কারমূলক উক্তি করেন খোয়াড়গণ। যেমন - "হা - ডু - ডু ভাই, ঠ্যাং ভাঙলে আমার দোষ নাই।" গ্রামীণ এই খেলাটির মধ্যে গ্রাম জীবনের সার্থকতার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। হা - ডু - ডুই এই জেলার একমাত্র খেলা যা জেলার সর্বত্র সমান জনপ্রিয়। হা - ডু - ডু কে প্রকৃত পক্ষে উপস্থিত বুদ্ধির চেয়েও শক্তি ও সক্ষমতার খেলাও বলা যায়।

ইন্দোমঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য এই খেলায় সম্পূর্ণভাবে উপযোগী। স্থানীয় তরুণ ও যুবকগণ এই খেলায় অংশগ্রহণ করে বেশী। পূর্বে মেয়েরা এই খেলায় অংশগ্রহণ না করলেও বর্তমানে মেয়েদের মধ্যেও এই খেলার আগ্রহ বেশী। এই খেলায় পোষাকের কোন বাহুল্য নেই। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল কিংবা উন্মুক্ত সবুজ মাঠে আদুল গায়ে নেংটি, গামছা বা হাফপ্যান্ট পরেও কিশোর যুবকদের খেলতে দেখা যায়। শহরাঞ্চলের যুবকগণ এই খেলায় হাফপ্যান্ট পরেন। হা - ডু - ডু সাধারণতঃ দুটি নিয়মে খেলা হয়। (ক) মাটির উপর দাগ কেটে সীমানা তৈরী করে। (খ) সীমানা ছাড়া একটি কোট বন্দী ছড়া কবাডি। কোট বন্দী খেলায় গ্রাম্য যুবকগণ কোট বা ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অর্থাৎ মাপের দিকে বেশী নজর দেয় না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই এই সীমানার উপলব্ধি করাহয় বেশী। লোক সংস্কৃতিবিদ্ ওয়াকিল আহমেদ তাঁর লোক সংস্কৃতি গ্রন্থে হা - ডু - ডু খেলার একটি ছকের মাপ দিয়েছেন ২১×১৪ বর্গ হাত। কোট সাধারণতঃ একটি সরল রেখা দ্বারা মাঝ বরাবর সমান ভাবে বিভক্ত থাকে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই খেলার নাম কবাডি হলেও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহারেও গ্রামীণ লোকায়ত জীবন থেকে এর হা - ডু - ডু নাম এখনও মুছে যায়নি। "বাংলাদেশে অঞ্চল ভেদে এই খেলার নাম গাং, থান, ভোড়।" [২] সীমানার নির্দিষ্ট রেখাটি এই খেলার গুরুত্বপূর্ণ রেখা। কারণ এই খেলার হার জিৎ নির্ভর করে এই রেখা পারাপারের মধ্যেই। মুক্তাঙ্গনের খেলা হলেও এই খেলাটি নরম মাটিতে অনুষ্ঠিত হয় বেশী। কারণ হাঁটু কনুই- এর উপর ভর পরে.বেশী। খেলোয়াড়দের বয়সের বিচারেই এই খেলার কোটের আয়তন বাড়ে ও কমে। ছোটদের কোট সাধারণতঃ ৩০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া থাকে কোন কোন অঞ্চলে।

এই খেলায় প্রতি দলে ৯ থেকে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। খেলোয়াড় 'কাটা' বা 'মড়া' হলে প্রতিপক্ষ এক পয়েন্ট পায়। কোটের দুই দিকেই সমান সংখ্যক খেলোয়াড় আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ভঙ্গিতে সজ্জিত থাকে। খেলার শুরুতেই এক পক্ষের যে কোন একজন মধ্যরেখা পেরিয়ে দম বন্ধ করে অপর পক্ষের কাউকে স্পর্শ করে, এই স্পর্শ করাকে কোথাও 'ডুক' বা বোল দেওয়া বলে। দম বা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা খেলোয়াড়কে বোঝাতে তাকে উচ্চস্বরে হা - ডু - ডু , কাবাড়ি, কাপাটি, কাপাটি, টিক্ টিক্ প্রভৃতি শব্দের যেকোন একটি উচ্চস্বরে একনাগাড়ে উচ্চারণ করতে হয়। কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই খেলায় রাক্ - রাক্, রাইক্ - রাইক্ এই শব্দগুলি উচ্চারিত হয়। এই ছড়া গুলির প্রয়োগ সাধারণত - প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে করা হয়। আবার কখনও বীরত্ব ব্যঞ্জক ধ্বনিও উচ্চারণ করা হয়। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ডুক দেওয়ার সময় প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে মধ্যরেখা পার হলে, যাকে স্পর্শ করা হয়, সে 'মড়া' হয়। সঙ্গে সঙ্গে খেলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সে কোর্টের বাইরে যায়। আবার যদি নিজেই আটকে পড়ে, বা দম ছেড়ে দেয়, তবে সেই 'মড়া' হয় এবং যথারীতি খেলা থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয় বার 'ডুক' দিতে আসবে পাল্টা দলের খেলোয়াড়। একেই পাল্টা ডুক বা পাল্টা দম বলা হয়। পাল্টা ডুক বা দমের সময়ই এই খেলায় দর্শকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আবার দমদেওয়ার সময় বিপক্ষ দলের কাউকে না ছুঁয়ে বা স্পর্শ করে ফিরে এলে খেলা অমীমাংসিত থাকে। দম দিতে গিয়ে যদি কোন খেলোয়াড় কোর্টের বাইরে চলে যায় তবে সে জল্যা (আংশিক মড়া) হয়। এই খেলার বৈশিষ্ট্য হল কোন দল বিপক্ষ খেলোয়াড়কে মেরে পয়েন্ট সংগ্রহ করে এবং একই সঙ্গে নিজের দলের 'মৃত' খেলোয়াড়কে জীবিত করতে পারে। যে কোন এক পক্ষের সকল খেলোয়াড় 'মৃত' হলে একটি গেম সম্পন্ন হয়।

লোকসংস্কৃতিবিদ্ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর 'বাংলার লোক সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় এই খেলার দম বা ডুক দেওয়ার একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন —

"আমি যাই পুবে
বাঁশ কাটি কুপে
বাঁশের নাই আগ
আমার নাম বাঘ।।"

এই খেলায় প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপ করে বাংলাদেশে একটি ছড়ার প্রচলন আছে। যেমন —

"হা - ডু - ডু পেয়ারা পাতা
দু - গালে ছেড়া জুতা।"

ডা. গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর 'প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ লোক সাহিত্য' নামক গ্রন্থের ৬৯ নং পৃষ্ঠায় কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত হা - ডু - ডু - খেলার দুটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন —

১) "চিকটা মাটি বৃন্দাবন
ঘড়ি বাজে ঠন্ ঠন্।"

২) "হারে তু হারেয়া বাঘ মারে বাড়েয়া
বাঘের রক্ত হরিণের শিং তোক মারিতে কতয় দিন।"

ডাংগুলি ঃ বাংলার গ্রামাঞ্চলের জনপ্রিয় খেলার অন্যতম এই ডাংগুলি খেলা। সমগ্র কোচবিহার জেলার গ্রামাঞ্চলেও সমান জনপ্রিয় এই খেলাটি। এক হাত পরিমাণ ঋজু গাছের শক্তডাল যাকে বলা হয় 'ডাং' এবং ছয় ইঞ্চির মত উক্ত ডালেরই একটি অংশ বা কাঠিকে বলা হয় 'গুলি'। এই দুটি বস্তুই এই খেলার প্রধান উপকরণ। প্রশস্ত রাস্তার তেপথী, চৌপথী, বা ফাঁকা মাঠ এই খেলার উপযুক্ত স্থান। ডাংগুলি খেলায় কোন ছড়া বলার প্রচলন নেই। তা সত্বেও কোচবিহারের কোন কোন গ্রামের যুবকগণ পূর্ববঙ্গীয় প্রভাবে এই খেলায় প্রতি এক শতে একহাত - একজন খেলোয়াড় কেনাকে বলা হয় —

"এ্যানা ব্যানা ছ্যানা
(নির্দিষ্ট ব্যাক্তি) ওমুককে নিয়ে কেনা"

প্রকৃতপক্ষে এটি পূর্ববঙ্গীয় খেলা। কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলের এই খেলাকে তাই বলা যায় — "মাইগ্রেটেড ফোক গেম"। এই খেলায় কোন কৌশলের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ডান হাতের শক্তিই এই খেলার প্রধান সম্পদ। খেলাটি প্রধানত দুই জনের হলেও অনেক গ্রামে দুই তিন জনের দুটি দলে ভাগ করে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। 'ফুলবাড়ি' ও 'ঘাই চাম্পা' এই দুটি পদ্ধতিতে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছোট গর্ত বা চৌকোনা ঘর এই খেলার একদিকের সীমানায় থাকে। ছোট্ট 'গুলি' মাটিতে না ফেলে ডান্ডার সাহায্যে যতবার স্পর্শ করা যাবে ততবার খেলার সুযোগ পাবে খেলোয়াড় ফুলবাড়ি নিয়মের খেলায়। টসে জিতে বিজয়ী দল গর্ত নেয়। গর্তের গুলি ডান্ডার আঘাতে বিপক্ষ দলের দিকে ছুঁড়ে মারলে বিপক্ষ দলের কেউ ক্রিকেট বলের মত মাটিতে পড়ার আগে গুলিটি লুফে নিলে ডান্ডাধারী ব্যক্তি দান হারাবে। তা না হলে ডান্ডাধারী খেলোয়াড় গুলি থেকে গর্তের সোজা দূরত্ব ডান্ডার সাহায্যে মাপে। এ সময় বা হাত পিঠে রেখে ডান হাতে মাপার চল আছে জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বিলসী ও শালবাড়ি গ্রামে। এই মাপ অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। জেলার মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চলে এই খেলায় দেখা যায় খেলোয়াড় ডাং দিয়ে গুলিকে একই সঙ্গে তিনবার স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে একশ পয়েন্ট হয়। দুইবার স্পর্শ করলে গুলি দিয়ে মেপে গর্তের কাছে আসতে হয়। একবার স্পর্শ করলে ডাং দিয়ে মেপে আসতে হয়। এভাবেই খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের মাধ্যমে পয়েন্টের তারতম্য হয়। এই খেলায় জয় - পরাজয় নির্ধারিত হয় কে কত দূরে গুলি ছুঁড়তে পারে তার মাপের উপর।

বাংলা দেশে এই খেলার মাপের বিভিন্ন নাম গুলি হল - "রংপুরে - গাইধন, ধলি, চাক্কোর, চালি, পান্ডু, গেট। ময়মনসিংহে — গয়া, দুয়া, তেনা, চারা, পাঞ্চা, ভইল। রাজশাহিতে — বাড়ি, দুড়ি, তেড়ি, চামর, চাম্পা। নোয়াখালিতে — এড়ি, দুড়ি, চাম্পা, জেক ইত্যাদি।"[৩] কোচবিহারে এই মাপের নাম — "১ হলে গাইদোন, ২ হলে ডুলি, ৩ হলে চক্র, ৪ হলে চালি, ৫ হলে পান্ডা, ৬ হলে বায়েন, ৭ এ গড় ইত্যাদি।"[৪] জেলার প্রায় সকল গ্রামে এই খেলায় ৭ পর্যন্ত গোনাই লক্ষ্য এবং প্রতি ৭ কে এক ইউনিট করে ধরা হয়। অনেক সময় ৭ ফুলে এক লাল বা গজ ধরা হয়। ঘাই চাম্পা পদ্ধতির খেলায় শুরুতে একজন খেলোয়াড় ডান্ডার সঙ্গে গুলিকে ধরে ছুঁড়ে দেয়। বিপক্ষ দল গুলি ধরতে পারলে যে ছুঁড়েছে তার হাত হারায় এবং না পারলে একজন খেলোয়াড় গুলিকে ঘরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ঘরের ভিতর বা দাগের এক বিঘত বা টাকর (৯″) দূরত্বের মধ্যে পড়লে এই খেলোয়াড়ের হাত নষ্ট হয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়গণ যে পর্যন্ত হাত না নিতে পারে ততক্ষণ এ ভাবে খেলা চলতে থাকবে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে ডাংগুলি খেলাই ক্রিকেট খেলার পূর্বসূরী। ক্রিকেট খেলার সঙ্গে এই খেলার সাদৃশ্য আছে অনেক। ক্রিকেট খেলায় যেমন বোলারের চেয়ে ব্যাটস্‌ম্যানের দায়িত্ব বেশী ডাংগুলি খেলাতেও তেমনি ডান্ডাধারীর দায়িত্ব বেশী। এই খেলায় ডাং ও গুলি হচ্ছে ক্রিকেটের ব্যাট ও বলের প্রতীক। ডাংগুলির গর্ত হচ্ছে ক্রিকেটের পীচ। ক্রিকেটের মত এই খেলায় ডান্ডাধারী বিভিন্ন ভাবে আউট হতে পারে। সেই অর্থে ডাংগুলিকে ক্রিকেটের গ্রাম্য সংস্করণ বলা হয়। কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী যুবকগণ সুপ্রাচীন কাল থেকেই এমনি আর একটি খেলায় অভ্যস্ত যার নাম 'চেমু' খেলা। ডাংগুলি প্রকৃতপক্ষে জেলায় পূর্ববঙ্গীয় স্থানান্তরিত' খেলা। কিন্তু এই খেলা প্রচলনের পূর্ব থেকেই কোচবিহারে 'চেমু' খেলার প্রচলন ছিল। এই চেমুকে জেলার অনেক মহকুমায় 'চেঙ্গু'ও বলা হয়। চেমু অর্থে এখানে ডাং বা লাঠিকেই বোঝায়। পরবর্তী অধ্যায় এই চেমু স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হবে।

গোল্লাছুট ঃ কোচবিহার জেলার আঞ্চলিক ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন খেলা হল গোল্লাছুট। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই এই খেলায় অংশগ্রহণ করলেও ছেলেরাই বেশী এই খেলার সঙ্গে যুক্ত। নির্দিষ্ট ছক বা মুক্তাঙ্গনে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। রেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই খেলায় দল তৈরীতে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। এতদঞ্চলে এই খেলার প্রাচীন ঐতিহ্য থাকলেও "গোল্লাছুট মূলতঃ বাংলাদেশের ঢাকা ও খুলনা জেলার খেলা।"[৫] নির্দিষ্ট সীমানায় দ্রুত দৌড়ের উপর এই খেলার সাফল্য নির্ভর করে। সমান সংখ্যক দুই দলের মধ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত মাঠ বা বাগানে এই খেলা চলে। গোল্লাছুট খেলায় মাঠের মাঝখানে একটি গর্ত খেলার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হয়। গর্ত থেকে ৪০ - ৫০ হাত দূরে সীমানা নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রের গর্তে একটি কাঠি থাকে তাকেই গোল্লা বলা হয়। এই গোল্লার কেন্দ্র থেকেই ছুটে গিয়ে কাউকে ছুঁয়ে আসাই খেলার মূল লক্ষ্য। এই জন্যই এই খেলার নাম গোল্লাছুট। অর্থাৎ গোল্লা থেকে ছুটে বেড়িয়ে আসাই এই খেলার নাম করণে প্রকাশিত হয়েছে। "এই খেলায় একজন দলপতি থাকে ও অন্যদের বলা হয় 'গোদা'।"[৬] এই খেলায় দৌড়ের কোন নির্দিষ্ট দিক নেই। এলো মেলো ভাবে ছুটে লক্ষ্য স্থানে পৌছাতে পারলেই হল। বিপক্ষ দল ছুলেই খেলোয়াড় 'মড়া' হয়। গোল্লাছুট খেলায় আত্মরক্ষার কৌশল ও আক্রমণকারী সম্পর্কে সতর্কতা ও বন্দিমুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

দাড়িয়াবান্ধা ঃ জেলার অন্যান্য লোকপ্রিয় গ্রামীণ খেলার মত দাড়িয়াবান্ধা খেলাও জেলার প্রায় সর্বত্র প্রচলতি। দাড়িয়াবান্ধা ছেলে ও মেয়ে উভয়রই খেলা। উন্মুক্ত মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় ঘর কেটে এই খেলা হয়। এই খেলায় কোটের পরিমাপ হয় সাধারণতঃ ৮৯′১″ লম্বা ও ২৩′১″ চওড়া। অঞ্চলভেদে এর পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। এই খেলা সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রচলিত থাকলেও সমগ্র বাংলার লোকপ্রিয় খেলা।

চেম্বু / চেঙ্গু ঃ কোচবিহারের লোকায়ত গ্রাম্য জীবনের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী লোকক্রীড়া 'চেমু' বা 'চেঙ্গু' খেলা। পূর্ববঙ্গীয় ডাংগুলিরই কোচবিহারের স্থানীয় সংস্করণ এই চেমু খেলা। "এই চেমু বা চেঙ্গু খেলা কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামে সাধারণত দুই রকম ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। একটি ডাঙ্গা বা মাটিয়া চেমু, অপরটি 'ঠকা' চেমু।"[৭] খোলা মাঠই এই খেলার প্রকৃত স্থান। ডাঙ্গা চেমু খেলায় দেখা যায় মাঠের যেকোন একটি অংশে ডিম্বাকৃতি একটি গর্ত করে তার মধ্যে চেমু বা ৫″ দীঘল একটি কাঠিকে কাৎ করে রেখে পেন্টি দিয়ে ডাং মেরে পাঠালে পেন্টি দিয়ে মেপে খেলোয়াড় ঐ গর্তে হাজির হয়। দুই বার ডাং মেরে পাঠালে ৫″ দীঘল চেমু দিয়ে মেপে আসতে হয়। প্রতিক্ষেত্রে পেন্টি বা চেমু দিয়ে গুনে গর্তে ফেরার সময় বাহাত পিঠে রাখতে হয়। কিংবা তিনবার ডাংমেরে পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে ৫ গুণন ২০ অর্থাৎ ১০০ পয়েন্ট হয়। এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই গেম। ডাঙ্গা চেমু খেলায় দেখা যায় একজন করে খেলেই পয়েন্ট তোলা হয় এবং পালা করে যে বেশী পয়েন্ট তোলে

সেই জয়ী হয়। এই খেলার প্রধান উপকরণ হল একটি দেড় হাত দৈর্ঘের সমান পেন্টি এবং একটি ৫" দৈর্ঘের পেন্টির টুকরো যাকে বলা হয় চেমু। শুধুমাত্র ছেলেরাই এই খেলায় অভ্যস্ত। এই খেলায় বুদ্ধির চেয়ে হাতের জোরই বেশী প্রয়োজন।

অপরপক্ষে ঠকা চেমু খেলার উপকরণ হচ্ছে আড়াই থেকে তিন ফুট উচ্চতার একটি বাঁশের খুঁটি (ঠকা) যা খেলার মাঠের মধ্যখানে প্রোথিত থাকে। আর ৫" লম্বা একটি পেন্টির অংশ এবং দেড় ফুট লম্বা একটি পেন্টি। এ খেলায় অবশ্যই দুজন খেলোয়াড় লাগে। ঠকার উপর চেমু নামক পেন্টির টুকরোটি বসিয়ে খেলোয়াড় এক ডাং এ সেটিকে দূরে পাঠান এবং বিপক্ষের খেলোয়াড়দের হাতেও সমান মাপের পেন্টি থাকে। তারা সেই পেন্টি দিয়ে চেমু স্পর্শ করলে খেলোয়াড় আউট হয়। আবার পেন্টি দিয়ে চেমুকে স্পর্শ না করে ডান হাতে সেই চেমু ছুঁড়ে ঠকা স্পর্শ করলেই খেলোয়াড় আউট হয়। এ জায়গায় খেলোয়াড়দের ভূমিকা অনেকটা ক্রিকেটের ব্যাটস্‌ম্যানের মত এবং আউট হওয়ার পদ্ধতিটা ক্রিকেটের স্ট্যাম্প আউটের মত হয়। আর যদি ঠকা স্পর্শ না করে প্রথম খেলোয়াড় পেন্টি দিয়ে যতবার চেমু স্পর্শ করবে তত পয়েন্ট হয়। এভাবে কুড়ি পয়েন্ট হলে মাটিতে দাগ কেটে সংকেতের মাধ্যমে এই কুড়ি পয়েন্টকে মনে রাখা হয়। কোচবিহারের চেমু খেলাই বাংলার প্রাচীন ডাংগুলি খেলার প্রাচীন বা আদিম রূপ।

বাসুদিয়া ঃ কোচবিহারের লোক ক্রীড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এতে মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরই প্রাধান্য বেশী। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর "Rajbansis of North Bengal" গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় স্থানীয় রাজবংশী সমাজে প্রচলিত শিশু - কিশোরদের এই জনপ্রিয় খেলার উল্লেখ করেছেন। এটি অনেকটা শহুরে ছেলে মেয়েদের রান্নাবাটি খেলার মত। এই খেলায় দেখা যায় কয়েকটি শিশু মাটি দিয়ে কিছু একটি খাদ্য বস্তু রান্না করে কিন্তু তারা ঐ বস্তু খায় না। এরূপ রান্নাকে বলা হয় 'বাসুদিয়া'। এই বাসুদিয়া খেলার সময় শিশুরা যে গানটি করে তা হ'ল —

"গুদু গুদু মানা পাত
জল আনতে হইল ভাত।।"

ঠেংগুহাটা ঃ ঠেংগু শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'ঠ্যাং' অর্থে পা এবং 'হাটা' অর্থে হেঁটে যাওয়া। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হল কৃত্রিম পায়ে হেঁটে যাওয়া। বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে রণপা নামে যা পরিচিত সেই রণপাই কোচবিহারে 'ঠেংগু' নামে পরিচিত। কোচবিহারের লোকক্রীড়ার ইতিহাসে ঠেংগু খেলা হল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলার নিদর্শন। এই খেলায় দেখা যায় দুটি বিশেষ জাতের লম্বা বাঁশের (বড় বাঁশের) দুই বা তিন ফুট উঁচুগীটে একটি পা রাখার স্থান রেখে বাঁশটি কাটা হয় এবং এই গীট বা সম্পূর্ণ বাঁশটির উচ্চতা নির্ভর করে যিনি হাঁটবেন বা খেলবেন তার উচ্চতার উপর। এই খেলার মূল উপকরণই হল উক্ত উচ্চতায় গীট যুক্ত দুটি সমান মাপের বাঁশ। বাঁশটির বেড় হবে খেলোয়াড়ের মুষ্টিবদ্ধ হাতে ধরার উপযোগী। জেলার প্রায় সকল গ্রামেই এখনো বিলুপ্তপ্রায় এই খেলায় দেখা যায় বিশেষ করে গ্রামীণ যুবকগণ ঠেংগু নামক বাঁশটির গীট যুক্ত অংশে পা রেখে দৃঢ় মুষ্টিতে দুই হাতের সাহায্যে বাঁশটি ধরে সেই বাঁশের সাহায্যে কখনও অগ্রসর হয় কখন ও পশ্চাৎপদ হয়। গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক সময় ঠেংগু হাটা প্রতিযোগিতাও হয়। পূর্বে এই ঠেংগুর দ্বারা অনেকে খানা খন্দ এবং জঙ্গলের ভেতর অনেক দূর্গম স্থানে হেঁটে যাওয়ার অভ্যাস করতেন। ঠেংগু খেলার দক্ষতাই হল নিজের শরীরের ভারসাম্য সঠিক রাখা। এই খেলায় প্রথমেই কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন না, কারণ দুটি বংশ দন্ডের উপর নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কিছুদিনের অভ্যাস দরকার। বাংলার অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী নৃত্যে দেখা যায় অনেকে যোদ্ধার বেশ ধারণ করে কাঁধে কৃত্রিম ঢাল নিয়ে ঠেংগুর উপর দাঁড়িয়ে এই নাচ প্রদর্শন করেন। কোচবিহারের লোক সংস্কৃতির এই উজ্জ্বল নিদর্শন আজ অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জমান।

তোসর তোসর খেলা ঃ জেলার প্রাচীন গ্রামীণ লোকক্রীড়ার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল "তোসর তোসর" খেলা। এটি প্রকৃত পক্ষে শিশুদেরই খেলা। এই খেলায় দেখা যায় চার পাঁচটি শিশু দুহাত বিস্তার করে বৃত্তাকারে বসে পড়বে। এদেরই একজন ঐ বৃত্তের বাইরে ঘুরে ঘুরে ছড়া বলবে এবং হাতের চেটো দিয়ে স্পর্শ করবে। যার পাশে গিয়ে ছড়াটি শেষ হবে সে-ই চোর সাব্যস্ত হবে। আর তখনই ঐ অভিযুক্ত চোর উঠে গিয়ে পূর্বের খেলোয়াড়দের মত বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে ছড়া কাটতে থাকবে। এভাবেই একাদিক্রমে ঘুরে ঘুরে খেলাও চলতে থাকবে। এটাই তোসর তোসর খেলার মূল আঙ্গিক। এমনি একটি

প্রচলিত তোসর তোসর খেলার ছড়া হল —

"আদা পাদা নুন খরোদা
একনা আদা পড়ি পানু
সবারে মুখত বাটি দিনু
যায় করিবে আও তারে মুখত খাও
যায় করিবে থু তার মুখত গু
যায় করিবে হোক্কা, তারে মুখত পোক্কা।"[৮]

একই খেলায় অঞ্চল ভেদে অনেক সময় ছড়ার শব্দ চয়নে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন দিনহাটা মহকুমার শিমুল বাড়িগ্রামে প্রচলিত এই খেলায় ছড়া হল —

"আদা পাদা লবন সাদা
যায় পাদিবে তার টিকাত ফোলা।"

হাতের পাতে খেলা ঃ এই খেলায় মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে বেশী। এ খেলায় কয়েকজন মেয়ে একটি বৃত্তের মধ্যে হাতের চেটো ছড়িয়ে বসে থাকবে, আর একজন ছড়া কাটতে কাটতে প্রত্যেকের হাতের তালুতে বা চেটোতে ঘুষি মারবে। ঘুষি মারা শেষ হলে যার চেটোতে কাট শব্দ উচ্চারিত হবে সে হবে পাক্কা। সে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। এভাবে পাক্কা হতে হতে সর্বশেষে পাক্কা খেলোয়াড়টি চোর সাব্যস্ত হবে। অন্য খেলোয়াড়গণ চোরকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং তাকে কিছু উত্তর দিতে হবে। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর "Rajbansis of North Bengal" (পৃ - ৭৬) নামক গ্রন্থে এই খেলার একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন। যেমন —

'ইচন বিচন ধাউরি বিচন
তাতে আছে মঙ্গল কাটা
মঙ্গল কাটা নড়ে চড়ে
আই কুমারী ডাক পারে।
এলে রে বেলে রে
ফুল তুলিবার গেলে রে।
ফুলের মান ডালা পাত
ছিড়ি আংটি হাত কাট।।"

এই একই খেলায় তুফানগঞ্জ মহকুমার বিলসী গ্রামের মন্টু দাস যে ছড়াটি বলেন তা হল —

'ইচন বিছন ধাবরী বিছন
গরু চড়াইতে পাইলাম বিছন
এলের পাত বেলের পাত
কাট কুট তোল হাত।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পূর্ববঙ্গীয় 'ইকির মিকির' খেলাই কোচবিহারের স্থানীয় সমাজে 'হাতের পাতে' খেলা নামে পরিচিত।

পাখি খেলা ঃ কোচবিহার জেলার কৃষিজীবী পরিবারের যুবক কিশোরদের একটি জনপ্রিয় খেলা হল পাখি খেলা। এ খেলার সময় সাধারণত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস। ধান কাটার পর উন্মুক্ত ক্ষেতে কিংবা কোন মাঠে দিনের বেলায় এই খেলা

অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এটি দিনের খেলা হলেও অনেক সময় মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতেও চাঁদের আলোয় এই খেলায় অনেকে অভ্যস্ত। রাতের বেলায় এমন মুক্তাঙ্গন খেলা জেলার অন্যত্র খুব বেশী দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে শেষ রাত্রি পর্যন্ত এই খেলা চলে। খেলায় প্রত্যেক দলে সাত জন করে খেলোয়াড় থাকে। এটি সম্পূর্ণই ছেলেদের খেলা। প্রথম সাত জন দুই হাত ছড়িয়ে খেলার নির্দিষ্ট স্থানে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রথমে প্রতিরোধকারী ছয়জন খেলোয়াড় পাশা পাশি লাইনে দাঁড়ায়। সপ্তম জনকে বলা হয় পাখি বা ঘোড়া; সে-ই একমাত্র আড়াআড়ি ভাবে সব লাইনে দৌড়তে পারে। এখানে খেলার কোর্টের কোন নির্দিষ্ট মাপ নেই। অর্থাৎ অনেকটা দাড়িয়াবান্ধা খেলার মত চিহ্নিত স্থানে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। লাইনে দাঁড়নো অবস্থায় পাখিকে ছুঁয়ে ফেললে সে 'মড়া'। প্রথম সাতজন কোর্টে থাকা কালীন অপর সাতজন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। "জেলার হলদিবাড়ি ব্লকের পয়ামারী গ্রামে কিশোর যুবকদের মধ্যে এই খেলার প্রচলন বেশী।"[৯]

গ্রামীণ ঘরোয়া খেলা ঃ

দাবা ঃ দাবা একটি শহুরে খেলা হলেও এর প্রাচীন লৌকিক রূপ এখনও আমরা দেখতে পাই জেলার বিভিন্ন গ্রামে। গ্রীষ্মের দুপুরে ছায়া সুনিবিড় বৃক্ষতলে কিংবা কোন অলস মধ্যাহ্নে কৃষি নির্ভর যুবক কিংবা রাখালিয়া বালকগণ, মৈষাল গরুমোষ চড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দাবার অনুকরণে যে খেলাগুলির সঙ্গে এখনও অভ্যস্ত তা হল — ষোল পাইতা, আটঘরিয়া এবং বাঘ ছাগল। এই লোকায়ত খেলাগুলির সঙ্গে দাবা খেলা সাদৃশ্য রয়েছে।

ষোলপাইতা ঃ কোচবিহার জেলার গ্রাম্য যুবকগণের অবসর বিনোদনের উল্লেখযোগ্য খেলা হল ষোলপাইতা। এ খেলা অঞ্চল ভেদে ষোলগুটি নামেও পরিচিত। এ খেলায় দু - জন খেলোয়াড় মুখোমুখি বসবে। দুজনকে ঘিরেই দুদলের পক্ষে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করার জন্য আর কয়েকজন তাদের ঘিরে বসবেন। ষোল পাইতা প্রকৃতই দাবা খেলার প্রাচীন রূপ। এই খেলায় তাই দাবা খেলার মত উত্তেজনা দেখা যায়। প্রত্যেকের হাতে থাকবে চার গন্ডা অথবা ষোলটি কড়ি বা তেঁতুল বীচি অথবা লাউয়ের বীচি। আড়াআড়ি ভাবে ঐ বস্তু গুলি প্রত্যেকেই ঘরে রাখার চেষ্টা করবে। এই খেলায় প্রত্যেক প্রতিযোগী তার ইচ্ছেমত হাতের গুটি চাল দিতে পারে। সবগুটি কখনই এক সঙ্গে চাল দেওয়া যাবে না। দুই পক্ষের হাতে অবশ্যই দুই রকমের গুটি থকবে। কারণ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যেন স্পষ্ট বোঝা যায়। এ খেলায় গুটি খাওয়ার নিয়ম অনেকটা তোসবোর খেলার মত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক খেলোয়াড়ই চেষ্টা করে তার হাতের গুটি পর পর তিনটি ঘরে সাজাতে। অপর পক্ষ অবশ্য তার গুটি দিয়ে পরপর তিনটি ঘরে সাজাতে পারে তবেই সে বিপক্ষের গুটি খেতে সক্ষম হয়। কোটের যে কোন স্থান থেকে বিপক্ষ দলের সবগুলি গুটি খেতে পারলেই সে বিজয়ী হয়। জেলার শতাধিক বছরের প্রাচীন অন্যতম লৌকিক ক্রীড়ার নিদর্শন এই ষোলপাইতা। জেলার সর্বত্র প্রচলিত ও সমাদৃত এই খেলার একটি ছক হল —

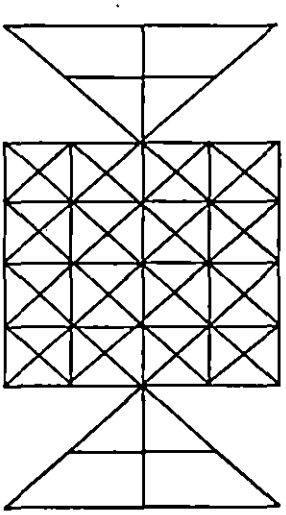

মোগল পাঠান ঃ কোচবিহার জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খেলার মধ্যে মোগল - পাঠান খেলা অন্যতম। এই খেলা ষোল ঘুঁটি বা গুটি খেলা নামেও পরিচিত। এই খেলায় প্রতিযোগী সাধারণত দুই জন। প্রত্যেকের ষোলটি করে গুটি থাকে। প্রথমে

একজন একঘর সামনে গুটি চাল দিয়ে খেলা শুরু করে। এরপর সুবিধামত আগেপিছে চাল দেয়, দুই পক্ষের খেলোয়াড়ই পরস্পরকে ঘুঁটি মারতে পারে। এই খেলা শুরু হয় অনেকটা দাবা খেলার ঢং - এ। কেবল লাফ দিয়ে গুটি চালার সুযোগ এলে গুটি মারা পড়ে। গুটি মেরে একপক্ষের ঘর শূন্য অথবা তার চালের গতি রোধ করতে পারলে খেলার জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। এই খেলাকেই আধুনিক দাবার গ্রামীণ সংস্করণ বলা যায়। জেলার সবকটি গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ যুবকদের অবসর বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম এই খেলা। গ্রামের চন্ডী মন্ডপ, বটপাকুরের ছায়ায় বাঁধানো চাতালে কিংবা কোন যাত্রী বিশ্রামাগারের বসার আসনে, নদীর বাঁধের ধারে কিংবা কোন ব্রীজের পিলারের নির্জন কোনে দাগ কেটে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মোগল পাঠান ও ষোল গুটি খেলায় প্রচ্ছন্ন ভাবে যুদ্ধের কৌশল বা আক্রমণাত্মক ভঙ্গি থাকায়, ধৈর্য, সতর্কতা এবং কৌশলের প্রয়োজন হওয়ায় এই খেলাকে মোগল পাঠান খেলা বলে। মোগল পাঠানের যুদ্ধও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যুদ্ধের শতক মোগল ও পাঠানের যুদ্ধের স্মৃতি আশ্রিত সময় থেকেই এই খেলার প্রচলন বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী তাঁর "Cooch Behar state and Its Land Revenue Settlement" গ্রন্থে এই খেলার উল্লেখ করেছেন। শতাধিক বছর পূর্বেও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এই খেলা কোচবিহারের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোক ক্রীড়া, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কোচবিহারে মোঘল - পাঠান খেলার উৎস সম্পর্কে বলা যায় "মহারাজা নর নারায়ণকে তৎকালীন কোচরাজ্যে পাঠানগণের সাহায্যকারী বলে অভিহিত করা হত। ১৫৮৭ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়। ১৫৭৬ খ্রীঃ পাঠান রাজ দায়ুদখাঁর পতন হলে বঙ্গরাজ্য মোগল অধিকৃত হয়েছিল কিন্তু ভুঁইয়া রাজারা এবং পাঠান সর্দারগণ সহজে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হননি। ১৬০০ খ্রীঃ পর্যন্ত উড়িষ্যা এবং ঘোড়াঘাট প্রদেশ মোগল পাঠান বিবাদে উচ্ছন্ন প্রায় হয়েছিল। এই বিবাদ অবলম্বনেই মোগল পাঠান খেলার সৃষ্টি হয়েছে বলে কোচবিহারে প্রসিদ্ধি আছে।"[১০]

বাঘছাগল ঃ জেলার অপর জনপ্রিয় বুদ্ধিমত্তা ও বিনোদনের খেলা হল বাঘছাগল খেলা। এ খেলায় এক পক্ষে কোন কোন গ্রামাঞ্চলে দুটি বাঘের প্রতীক হিসেবে দুটি বড় গুটি থাকে অপর পক্ষে ২২ টি ছাগলের প্রতীক হিসেবে বাইশটি গুটি থাকে। আবার এই ক্ষেত্রে দুটি বাঘ বাইশটি ছাগলকে খাবে। মেখলিগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় একটি বাঘের বিপরীতে ষোলটি ছাগল থাকবে। অর্থাৎ এখানে একটি বাঘ ষোলটি ছাগলকে খাবে। ছাগল চেষ্টা করবে বাঘের রাস্তা বন্ধ করতে। "স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ছাগল বাঘকে ফান্দে ফালাবে।"[১১] একাদিক্রমে বাঘ যদি চারটি ছাগল খেয়ে ফেলে তখন ছাগল বাঘের পথ আটকাতে পারে না। এ খেলায় বাঘ ও ছাগলের মধ্যে কে জিতবে তা নির্ভর করে খেলোয়াড়ের উপস্থিত বুদ্ধি ও আক্রমণাত্মক কৌশলের উপর।

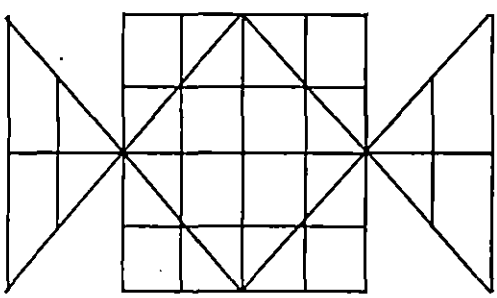

আটঘরিয়া ঃ এ খেলার একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে দুই পক্ষের খেলোয়াড়ের দুই রকম গুটি থাকে। এক সঙ্গে দুই জনকে খেলতে হয়। খেলায় প্রতিপক্ষে চৌত্রিশটি করে গুটি থাকে। যে কেউ চাল দিয়ে খেলা শুরু করতে পারে। জেলার সর্বাধিক জনপ্রিয় ঘরে ও বাইরের কোট বন্দি এই খেলায় সাধারণত গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কচুর ডগা, (সাদা ও কালো), কিংবা নুড়ি পাথর। কোন কোন গ্রামে তেঁতুল বিচি ও সুপারির প্রথম কোরক গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খেলার প্রথম পক্ষ চাল দেওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষ এমন ভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে চাল দেবে যাতে অপর পক্ষের একাধিক গুটি খাওয়া যায়। "এ খেলায় কোন পক্ষ ডিঙিয়ে বা টপকে একাধিক গুটি খেতে পারে। এই ভাবে দুই পক্ষ একে অপরের গুটি খেতে খেতে যার হাতে গুটি কম থাকবে সে হেরে যাবে।"[১২] এ খেলায় মূল ছকের বা কোটের চারদিকে আটটি ঘর থাকার জন্য একে আটঘরিয়া খেলা বলা হয়। খেলার একটি নিয়ম হল — হাতে গুটি থাকা পর্যন্ত গুটি বসিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে যদি খাওয়ার সুযোগ থাকে খেয়ে নেবে। আটঘরিয়া খেলা সাধারণত বাড়ির 'ডারিঘর' (বৈঠক খানা), বট পাকুরের বাঁধানো চাতাল বা গাছের ছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির স্থানীয় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কিশোর যুবকরাই অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এই

খেলাকেই বেছে নেন বেশী।

আটঘরিয়া খেলার একটি ছক —

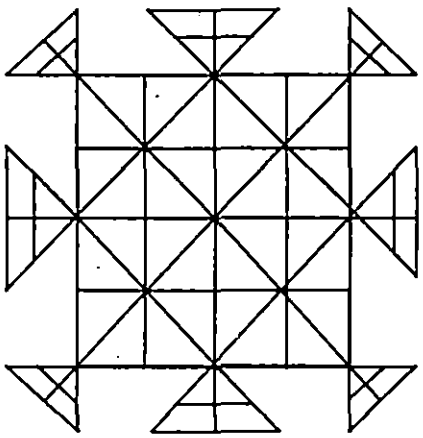

ঘু - ঘু - সই ঃ কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামাঞ্চলের শিশুদের একটি বিনোদন মূলক খেলা হল ঘু - ঘু - সই। খেলায় শিশুগণ মুক্তাঙ্গনে গোল হয়ে বসবে। খেলার পরিচালকের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল প্রথমে সে মুঠো করে হাত দিয়ে ধরবে এবং তাকে অনুসরণ করে হাতে বুড়ো আঙ্গুল অন্যরাও সে ভাবে ধরবে। এ ভাবে সকলে ধরার পর পরিচালক ও অন্যরা গোটা শরীরটা দোলাতে থাকবে। এভাবে দোলানোর সময় শিশুরা যে ছড়াটি বলে তা হল —

"এলে ঘুঘু বেলে ঘুঘু সগল ঘুঘু চোর,
মাটিয়া ঘুঘু ডিমা পাড়ে নটর পটর।
নট করে নটুয়া ভইসের মটুয়া,
ভইসের তেলে বার বাতি জ্বলে।
জ্বলুক বাতি পুরুক তেল,
আমমারটা পাকা বেল।"[১৩]

এক্কা দোক্কা ঃ কোচবিহারের সমগ্র গ্রামাঞ্চলের জনপ্রিয় মেয়েদের খেলা হল এক্কা দোক্কা। লোক সংস্কৃতিবিদ্ মহঃ আব্দুল হাই এই খেলার নাম দিয়েছেন 'সাত খোলা'। উত্তরবঙ্গের অনেক অঞ্চলের মত কোচবিহারেও অনেক গ্রামে এই নাম হল — এক্কা, দোক্কা, তেক্কা, চৌক্কা, পক্কা, লাঠি। এটিও জেলার অন্যতম স্থানান্তরিত খেলা। ভাঙা হাড়ি, কলসীর টুকরো, টালির টুকরো ইত্যাদিকে চারা, ঘুঁটি, চাকতি, ডিগ্নিল প্রভৃতি নামে বলা হয়। দলবদ্ধ ভাবে খেললেও প্রত্যেকের স্বার্থ ও দায়িত্ব তার নিজের। শুরুতে বাইরে থেকে একেকটি ঘরে চারা বা ডিগ্নিল ছুড়ে দিতে হয়। তার পর একপায়ে ভর করে ঘরের দাগ লাফদিয়ে পেরিয়ে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ঠেলে সেই চারা বা গুটিকে বাইরে নিয়ে যেতে হয়। এটি সম্পূর্ণই মেয়েদের খেলা। অনেক গ্রামে মেয়েরা দম দেওয়ার মত কিৎ কিৎ বা কুৎ কুৎ শব্দ করে। খেলোয়াড় সতর্ক থাকেন চারা বা ডিগ্নিল ছোড়ার ব্যাপারে। এই খেলায় বিশ্রামের ঘর ছাড়া অন্যঘরে দুই পা একত্রে মাটিতে ফেললেই খেলোয়াড় আউট হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে চারা দাগের উপর থাকলেই আউট হয়। প্রথম খেলোয়াড় আউট হবার পর দ্বিতীয় খেলায়াড় খেলা শুরু করে। কোন খেলোয়াড় একা সব ঘর বাগে আনতে পারলেই সে জয়ী হয়। এ খেলায় শারীরিক ব্যায়াম যেমন হয় তেমনি এতে কোন ঝুঁকি নেই, প্রখর বুদ্ধি বা কৌশলের প্রয়োজন নেই। "মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীই পুরুষকে ঘর বাঁধার প্রেরণা দিয়েছে। ঘর দখল, ঘরকন্নায় নারীর সক্রিয় ভূমিকা আজও অটুট।"[১৪] এই খেলায় প্রাচীন সংস্কারের ও অভ্যাসের পরিচয় কোচবিহারের প্রায় সকল

গ্রামেই দৃষ্ট হয়। "বাংলা তথা পূর্বভারতের প্রচলিত প্রধান ভূমিব্যবস্থার রূপ টি আভাসে ইঙ্গিতে এক্কাদোক্কা লোকক্রীড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়।"[১৫] কোচবিহারে প্রচলিত এক্কাদোক্কা খেলার ছকটি হল নিম্ন রূপ —

৬	৬	লাঠি (ছক্কা)
৫	৫	পাক্কা
৪	৪	চৌক্কা
৩	৩	তেক্কা
২	২	দোক্কা
১	১	এক্কা

ইকির মিকির ঃ দক্ষিণবঙ্গ ও বর্তমান বাংলাদেশের মত সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের একটি প্রচলিত এবং সর্বজন পরিচিত লৌকিক ছড়ার খেলা হল — 'ইকির মিকির'। ছোট বেলায় এই ছড়ার খেলা খেলেনি এমন মানুষ পাওয়া দুস্কর। শিশুমনের আনন্দ ও ঔৎসুক্যের অভিব্যক্তি ঘটে এই খেলায়। কোচবিহারে এই খেলার প্রাচীন ঐতিহ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটি অবিভক্ত বাংলার লৌকিক ক্রীড়া। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিনির্ভর লোকায়ত জীবনে, বিশেষকরে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রামীণ খেলায়। হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় ভারত ও নেপালের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মেচ নামক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ইকির মিকির লোক ক্রীড়াটি 'অচল বিচন গেলেনাই' নামে পরিচিত। এই ক্রীড়া পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ এক হলেও শুধু পার্থক্য এই যে তারা খেলাটিকে লুকোচুরি খেলার শুরু হিসেবে ব্যবহার করেন। এই খেলার সাহায্যে তারা চোর নির্বাচন করে একটি ছড়া বলে খেলা শুরু করেন। প্রচলিত এরূপ একটি ছড়া হল —

"অচোন বিচোন
গুমরি বিচোন
পথে লাগে চিরিং বিরিং
হাথ কাথ।"[১৬]

কোচবিহারে রাজবংশী সমাজে জনপ্রিয় এই খেলাটি হাতের পাতের খেলা নামে পরিচিত। জেলার পাঁচটি মহকুমার গ্রামাঞ্চলের শিশুগণ তাই ইকির মিকির নামান্তরে হাতের পাতে খেলায় অভ্যস্ত। সেক্ষেত্রে ছড়ায় বলা হয় 'ইচোন বিচোন ধাবরি বিচোন।' পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিং, কোচবিহার জেলায় এই খেলার সংশ্লিষ্ট ছড়াগুলি হল —

"ইছন বিছন দরগা বিছন,
উঠ উঠ বউ গো
মোমের ছাতি ধর গো
মোমের ছাতি উভরা
ফাল দিয়া ধর দুধরা
এল পাত বেল পাত
নও গো তোমার সোনার হাত। — ময়মনসিংহ

"ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
তায় পল্লো মাকড় বিচিং
মাকড়েরা লড়ে চড়ে
সাত কুমড়ায় ডিম পাড়ে।"[১৭] — ঢাকা

একই ছড়া কোচবিহারের হাতে পাতে খেলার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই —

'ইচন বিছন ধাবরী বিছন
গরু চড়াইতে পাইলাম বিছন
এলের পাত বেলের পাত
কাটকুট তোল হাত।" — কোচবিহার।

ইকির মিকির এই খেলা নামকরণ হয়েছে কেলার ছড়ার মধ্যে থেকেই। এই খেলার ছড়াটি এক অর্থে বিশ্বাস ঘাতকতার দলিল বলা যায়। ছড়ার ভাষায় অনেক ব্যঙ্গোক্তি ফুটে ওঠে। খেলাটির বৈশিষ্ট্য হল ছড়া ও খেলা একই সঙ্গে চলে। শিশুদের মধ্যে বয়সে যে বড় সে-ই ছড়া আবৃত্তি করে। কোচবিহারে প্রচলিত লোকায়ত এই খেলার আঙ্গিকে দেখা যায় শিশুরা বাড়ির উঠোনে বা বারান্দায় মাটিতে হাত পেতে আঙ্গুল ছড়িয়ে রাখে এবং বসার অবস্থান থাকে বৃত্তাকারে। একেক জন করে প্রত্যেকেই আঙ্গুল স্পর্শ করে ছড়া বলতে থাকে। ছড়ার শেষের ঝোঁকটা যে আঙ্গুলে গিয়ে শেষ হবে সেই খেলোয়াড় তৎক্ষণাৎ সেই আঙ্গুলটি ভাঁজ করে রাখবে। এমনি করে সব আঙ্গুল স্পর্শ করার ফলে ভাঁজ হয়ে গেলে মুষ্টিবদ্ধ হাতটি পিছন পিঠে লুকিয়ে রাখতে হয়। বাংলাদেশে এই মুষ্টিবদ্ধ হাত পেট বা বগলে চেপে রেখে গরম করে এবং ছড়া পুনরাবৃত্তি শেষে প্রধান খেলোয়াড় মুষ্টিবদ্ধ হাত খুলে দেখে কার হাত কতটা গরম। যার হাত ঠান্ডা হবে তাকে চোর সাব্যস্ত করা হয় এবং সে খেলায় পরাজিত হয়। কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় ব্যতীত পূর্ববঙ্গীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইকির মিকির খেলার সর্বজন পরিচিত ছড়াটি হল নিম্নরূপ —

'ইকির মিকির চাম চিকির
চামে কাটা মজুমদার।
ধেয়ে এল দামোদর,
দামোদরের হাঁড়ি কুঁড়ি,
দুয়ারে বসে চাল কুড়ি,
চাল কুড়িতে হল বেলা,
ভাত খাও যে জামাই শালা।
ভাতে পড়ল মাছি,
কোদাল দিয়ে চাছি।
কোদাল হল ভোতা,
খা খেঁক শিয়ালের মাথা।"

জলের ক্রীড়া ঃ

ওক্‌টুল বক্‌টুল খেলা ঃ

এটি একটি মুক্তাঙ্গন স্থলের খেলা হলেও কোচবিহারের অনেক গ্রামে এই খেলা জলেও অনুষ্ঠিত হয়। খেলার শুরুতে টস করে ওক্‌টুল বক্‌টুল কথাটি বলে খেলাটি শুরু হয়। স্থান ভেদে এই খেলাকে "ভৈল" খেলাও বলা হয়। জলের ক্ষেত্রে যিনি টসে জিতবেন তিনি বিপক্ষের দলের খেলোয়াড়কে প্রশ্ন করবেন। যেমন — হাতের আঙ্গুল দেখিয়ে বলবেন — এটা কি ? উত্তর আসবে আঙ্গুল। আবার প্রশ্ন আসবে, কাটলে কি বিরায় ? উত্তর আসবে অক্ত। প্রশ্নকর্তা তখন 'মোর নাগাল ধরত' এই কথা বলে জলে ঝাঁপ দেন। বিপক্ষ দলও তখন জলে নেমে তাকে খুঁজতে থাকে। প্রশ্নকর্তা ডুব সাঁতার দিয়ে অন্যত্র ভেসে ওঠে। এভাবেই চলে জলের মধ্যে ধরা ছোঁয়ার লুকোচুরি খেলা। আবার যখন এই খেলা স্থলে অনুষ্ঠিত হয় তখন খেলোয়াড়গণ স্থলকে জল কল্পনা করে বাড়ির উঠোন বা খোলা মাঠে গোল হয়ে দাঁড়ায়। তারপর যিনি টসে জয়ী হন তিনি ওক্‌টুল বক্‌টুল ছড়া বলবেন। ছড়ার শেষ বাক্য যার কাছে গিয়ে থামবে তিনি হবেন চোর এবং এই চোরই খেলা শুরু করবে।

এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় (জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ছালাপাক গ্রামে) দেখা যায় পাঁচ, সাত, নয় জন করে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। এ খেলায় চোর কাউকে ছুঁতে যাওয়ার সময় বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় যদি কোন কারণে দৌড়তে না পারে তবে তিনি হাঁটুগেড়ে পায়ের নীচ দিয়ে হাত দিয়ে কান ধরে বসে পড়েন। সে ক্ষেত্রে তাকে কেউ স্পর্শ করলেও সে আউট হবে না। ওক্‌টুল বক্‌টুল খেলায় উপস্থিত বুদ্ধি ও শত্রুপক্ষের আক্রমণ ও পলায়নের ভঙ্গি বেশী প্রকাশ পায়। এই খেলার একটি প্রচলিত ছড়া হল —

(যা খেলার আগে টসে নির্বাচিত খেলোয়াড় ছড়াটি বলে খেলা শুরু করেন) —

"ওক্‌টুল বক্‌টুল ফোটে
পানিয়ার ছাওয়ার দুল দুল কাঁপে
কাঁপা কাঁপি নিমের ঠাল
লাল লতা গোলাপ ফুল
আনতো বাপই হুকা টা
হুকাত কেনে কাই
সুটকা চোরার ভাই।"[১৮]

জলকুমির খেলা ঃ বাঙালীর লোক জীবনে বাঘ ও কুমিরের বিড়ম্বনার কথা আজ সুবিদিত। নদীমাতৃক কোচবিহারে বনের বাঘের মতই কুমির নামক জল জন্তুটি এক সময় গ্রামবাসীদের আতঙ্কের সৃষ্টি করত। নদী পারাপারে, মৎস্যশিকারে, জলপথে বাণিজ্য ছাড়াও স্নান করার মত দৈনন্দিন কর্মে অনেক সময়ই বনের বাঘ ও জলের কুমিরের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এখনো জেলার সত্তর উর্ধ্ব প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে স্বচক্ষে বাঘ দেখার ও বাঘের গল্পের কথা মুখে মুখে ফেরে। কোচবিহারের লোক বিশ্বাসমতে স্থানীয় মানুষ বাঘকে স্ব - নামে উচ্চারণ না করে বলেন 'বুড়ার ব্যাটা'। বিশেষ করে রাত্রি বেলা অনেকেই সংস্কার বসে বাঘ নাম উচ্চারণ করেন না। আবার নদী পথ বা জল ভূমিতে কুমিরের উপদ্রবের কথাও কম শোনা যায় না। কি ভাবে কুমির মানুষ শিকার করত তারই কৃত্রিম অভিনয় এই জলকুমির খেলায় দেখা যায়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়েই আবিষ্কার হয়েছে এই খেলার। খেলাটির নামের মধ্যেই জলের কথা উল্লেখ থাকলেও স্থলকে জল কল্পনা করে স্থলেও এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীর উন্মুক্ত উঠোন বা কোন মুক্তাঙ্গনই এই খেলার প্রকৃত স্থান। সেই ক্ষেত্রে বাড়ির বারান্দা বা উঠান জল ও ঘাটের কৃত্রিম পটভূমি তৈরী করে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দলবদ্ধভাবে দশবারোজন একত্রে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। একজন কুমিরের ভূমিকায় থেকে অন্যদের স্নানের সময় আক্রমণ করাই এই খেলার আনন্দ। কৃত্রিম অভিনয়ে স্নান করতে নেমে অনেকে 'হাপুস হুপুস' শব্দও করে। অনেকে 'কুমির তোর জলে নেমেছি' বলে ছড়া কাটে। কুমির সুযোগ বুঝে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে সে কুমির হয়। তখন আগের কুমির ছাড়া পেয়ে ঘাটে ওঠে। জল - কুমির খেলার এটাই নিয়ম। জল কুমির খেলায় ছেলে এবং মেয়ে বিশেষ করে কিশোর কিশোরীরাই অংশগ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গেই বলা যায় জলকুমির খেলা স্থলে অনুষ্ঠিত হলেও নদীমাতৃক কোন কোন গ্রামে এই খেলা জলেও অনুষ্ঠিত হয়। তবে জলের খেলায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরাই অংশগ্রহণ করে। জলে খেলার প্রথম শর্ত হল — প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই সাঁতার জানতেই হবে। এখানেও একজনকে কুমিরের ভূমিকায় সাঁতার দিয়ে স্নানার্থীদের আক্রমণই প্রধান লক্ষ্য। শরীর চর্চা বা ব্যায়ামের সুফল পাওয়া যায় একমাত্র জলে খেলাটি খেললে। অবসর বিনোদন ও আনন্দ উপভোগের চেয়েও আত্ম সচেতনতা ও আত্ম রক্ষার কৌশল রপ্ত করায় এই খেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নৌকাবাইচ খেলা ঃ

নদী প্রধান কোচবিহারে একদিন প্রচন্ড জনপ্রিয় ছিল এই খেলা। যদিও এই খেলার একটি অন্যতম শর্তছিল সাঁতার জানা অর্থাৎ কেউ সাঁতার না জেনে এই খেলায় অংশগ্রহণ করবেন না। নদীর পাড়ে বাস করে বারো মাসের ভাবনা মাথায় নিয়ে নদী ও নৌকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়তে হয় জেলার নদী সংলগ্ন গ্রাম ও গঞ্জের মানুষদের। বিশেষকরে রায়ডাক, কালজানি, গদাধর, তোর্ষা নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের খেলাধূলার মাধ্যমে আনন্দ দানে নৌকার ভূমিকাও কম নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রম, শক্তি, কৌশল ও সহিষ্ণুতার এই খেলা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। "তুফানগঞ্জ মহকুমার চৌকোশী বলরামপুর

গ্রামে প্রতিবছর আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর পরদিন কালজানি নদীতে 'নৌকা বাইচ' উৎসব আজও অনুষ্ঠিত হয়।"[১৯] রায়ডাক নদীতে রথযাত্রার দিন তুফানগঞ্জ রানীরহাট বন্দরের পূর্বে একদিন এই খেলার প্রচলন ছিল। নৌকা বাইচকে এক অর্থে আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় ক্রীড়াও বলা যায়। নৌকাভিত্তিক এই খেলার নাম স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে নৌকা বাইচ। পণ রেখে, বাজি ধরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই খেলার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। নৌকার দাঁড় টানার কৌশলই এই খেলার বৈশিষ্ট্য। জেলার লুপ্তপ্রায় নৌকা বাইচ নামক এই লোকক্রীড়ায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব বঙ্গের মত এখানেও নৌকা বাইচের সময় সারিগান করার চল আছে। মুসলিমগণ পীরের দোহাই দিয়ে অনেক সময় নৌকা চালান শুরু করেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে "বাংলার রাজনীতির আকাশে ক্রমে সামন্ত যুগের অবসান হলে দাঁড় বাহিত নৌকার স্থলে বাষ্পচালিত রণতরীর আমদানি হলে পূর্বের এই প্রকার নৌকা বাহিনীর লোপ পায়। কিন্তু পূর্বের সেই আচার ও অভ্যাস নৌবাহিনী ছেড়ে জনগণের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে নৌকা বাইচের মাধ্যমে বিরাজ করতে থাকে।"[২০] তাই লোককবির ভাষায় আমরা বলতে পারি —

"জলে চলে ইষ্টিমার ভাই
কলে চলে রেল গাড়ী
হায় মরি কলের বাহাদুরী।"

জেলার পাঁচটি মহকুমার লোকায়ত জীবনের লৌকিক খেলাধূলার পর্যালোচনায় ও ক্ষেত্র সমীক্ষায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। যেমন — এক্কাদোক্কা, ইচন বিছন ও গোল্লাছুটের মত কিছু খেলা গণিত শিক্ষা ও ছড়া কাটার মাধ্যমে রীতিমত লোকশিক্ষার বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোচবিহার জেলায় প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলিতে সমাজব্যবস্থার যেমন প্রতিফলন দেখা যায় তেমনি এই খেলাগুলিকে বলা যায় কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির প্রতীক। প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলির উল্লেখযোগ্য অপর বৈশিষ্ট্য হল এখানে একই খেলা একেক অঞ্চলে যেমন ডাংগুলি, চেমু, হা - ডু - ডু, ওক্‌টুল বক্‌টুলের একেক রূপ ও রীতিতে প্রচলিত। অঞ্চলভেদে লোকক্রীড়াগুলির ছড়ার শব্দ চয়ন ও পার্থক্য দেখা যায়। আবার নিয়মনীতিতে মাথাভাঙ্গার গোপালপুর গ্রামে চেমু বা হা - ডু - ডুর নিয়ম কানুন দিনহাটার বড় শাকদল গ্রামের কোন খেলোয়ার মানতে রাজি নন। এক কথায় কোচবিহারের লোকক্রীড়ায় কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই যা একাধারে লোকসংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জেলার লোকক্রীড়ার অবিচ্ছেদ্য অলঙ্কার হল এর ছড়াগুলি। যেমন — হা - ডু - ডু, ওক্‌টুল বক্‌টুল, ইচন বিচন, ডাংগুলি বা ডান্ডি খেলায় উচ্চারিত ছড়ার শব্দ চয়নকে আমরা আদিম সমাজের লক্ষণসম্পৃক্ত বলতে পারি। কোচবিহারে প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলি কোন না কোন ভাবে জেলারই লোকজীবনের অভিব্যক্তি। কোচবিহারের প্রাচীন কালের প্রচলিত কিছু খেলাধূলা সম্পর্কে খান চৌধুরী আমানতউল্লা সাহেব তাঁর 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন — "প্রাচীন কালে জীবনযাত্রা নির্বাহ অপেক্ষাকৃত সুগম ছিল এবং সর্বসাধারণে লেখাপড়া বা শিক্ষার প্রতি ততটা গুরুত্ব অনুভব করতেন না। এই জন্য ছেলেদের দল সতেরো, আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত লুকোচুরি, চিলাচিলা, গুটুগুটু, হাটুকুডুগ, চেঙ্গুপাইট, ভেটাপাইট, ডান্ডাপাইট, তে পাইতা এবং মোঘল — পাঠান প্রভৃতি খেলার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করতেন।"[২১] বর্তমানে অনেক প্রাচীন লৌকিক খেলাধূলা আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জমান।

তথ্য সূত্র ঃ

১। The Cooch Behar state and its Land Revenue settlements - Harendra Narayan Chowdhury, P - 138 (1903)
২। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ৪১৯ ঢাকা বাংলা একাডেমি, বাংলা দেশ (১৯৭৪)
৩। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ৪৩১ ঢাকা বাংলা একাডেমি, বাংলা দেশ (১৯৭৪)
৪। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্রসমীক্ষা — স্বপন রাভা, গ্রাম ছাটরামপুর, তুফানগঞ্জ, তাং — ২৮/৬/৯৯ ইং

৫। বাঙালীর খেলাধূলা — শঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ - ৬৭ (১৯৭৬)
৬। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ৪২৪ ঢাকা বাংলা একাডেমি, বাংলা দেশ (১৯৭৪)
৭। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্রসমীক্ষা — মন্টু দাস, গ্রাম - ছালাপাক, তুফানগঞ্জ স্বপন রাভা, গ্রাম - ছটরামপুর, তুফানগঞ্জ, তাং ২৫/৬/৯৯ ইং
৮। সাক্ষাৎকার — অনিল বর্মন, গ্রাম - ছালাপাক, তুফানগঞ্জ, তাং - ২৪/৬/৯৯ ইং
৯।ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — দীনবন্ধু রায় ও জগদীশ রায়, গ্রাম - পয়ামারী, ব্লক - হলদিবাড়ী, তাং - ২৫/৪/৯৮ ইং
১০। কোচবিহারের ইতিহাস (প্রথম খন্ড) — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ১১৮, কোচবিহার স্টেট (১৯৩৬) পুঃ মুদ্রণ ১৯৯০ ইং
১১। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — মন্টুবর্মন, শ্রীদয় বর্মন, গ্রাম — বিলসী, তুফানগঞ্জ, তাং ২৫/৪/৯৯ ইং
১২। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — তারিনী কান্ত সরকার, গ্রাম - উত্তর অন্দরাণফুলবাড়ী, তুফানগঞ্জ, তাং - ৭/৭/৯৯ ইং
১৩। প্রসঙ্গ ঃ উত্তরবঙ্গ লোকসাহিত্য — ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, ১ম পর্ব, পৃ - ৫৬ (১৩৮৮)
১৪। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ৪৩৮ ঢাকা বাংলা একাডেমি, বাংলা দেশ (১৯৭৮)
১৫। বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস — ড. অসীম দাস, পৃ - ১২৬ (১৯৯১)
১৬। বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস — ড. অসীম দাস, পৃ — ১৩৬ (১৯৯১)
১৭। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ৪৫৮ ঢাকা বাংলা একাডেমি, বাংলা দেশ (১৯৭৪)
১৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — ধনেশ্বর বর্মন, গ্রাম - ছাট গেন্দুগুড়ি, তুফানগঞ্জ, তাং - ৭/১/৯৮ ইং
১৯। পশ্চিম বঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (প্রথম খন্ড) — সম্পাদক - অশোক মিত্র, পৃ - ১৬৭ (১৯৬৭)
২০। বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খন্ড) — ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ- ৫৮৯ (১৯৭৩)
২১। কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড) — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৫৮ কোচবিহার স্টেট (১৯৩৬) পুঃ মুদ্রণ ১৯৯০ ইং